# অভিনয়ে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা

শম্পা ভট্টাচার্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' বইটির 'প্রাচীন ও নবীনা' প্রবন্ধে বলেছিলেন যে, 'সকল সমাজেই স্ত্রী জাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার কারণ; পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কার্য্যকর্তা; স্ত্রী জাতিকে কাজে কাজেই তাঁহাদিগের বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী; তাঁহার অতিরেক তিলার্দ্ধ নহে। এ কথা অন্যান্য সমাজ অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য।' ব্রিটিশ কালচারে অভ্যস্ত বাঙালি ভদ্রলোকেরা উনিশ শতকে আত্ম প্রয়োজনে লক্ষ্মণের গণ্ডী এঁকে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে মন দিয়েছিলেন। সমাজ সংস্কারকেরা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে যে নতুন পথে চলেছেন তা আদৌ লাভজনক কিনা সে বিষয়ে বঙ্কিমের সংশয় ছিল। উনিশ শতকের কলকাতায় যাত্রা, ঝুমুর, ঢপকীর্তন, পালাকীর্তন কিংবা যাত্রার মতো লোকসংস্কৃতিতে বাঙালির পুরনো ঐতিহ্য বজায় ছিল অনেকখানি। আত্মনির্ভরশীল, নিম্নবিত্ত ঘরের মহিলারা শিল্পী হিসেবে এখানে যোগ দিতেন। অশ্লীলতা বিরোধী অভিযান আর ইংরেজি শিক্ষার ভিক্টোরিয়ান রুচির দাপটে এই লোকসংস্কৃতি কুৎসিত, কদর্য নামাঙ্কিত হয়ে শহর থেকে পিঠটান দিয়ে গ্রাম গঞ্জে কিছুকাল কোনোরকমে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখে। কিন্তু ইংরেজি কেতাদুরস্ত শিক্ষিত বাঙালি সমাজে তাদের কোনো স্থান রইল না।

১৮৯০ খ্রিঃ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের নতুন চাহিদার একটি তালিকা পেশ করেছিলেন—'নব্য সম্প্রদায় চায় যে স্ত্রীটি বাংলা বেশ জানে, ইংরেজীতে কথাবার্তা বেশ কহিতে পারে, সেলি-বায়রণ পড়িতে পারিলে তো সোনায় সোহাগা। পিয়ানো বাজাইতে জানে, চিত্রবিদ্যায় নিপুণতা থাকে এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে পারে। স্ত্রীতে এই সব গুণ থাকিলে তবে তাহাদের মন উঠে এবং হৃদয়ের আকাঙ্খা তৃপ্তি হয়।' (বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলা সমাজ চিত্র, ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৬) এর কিছুকাল আগে থেকে অন্তঃপুরিকাদের পরিবর্তিত রুচির বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রশংসা করা হচ্ছিল।

স্ত্রী শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিল ভালো মা, ভালো জননী হওয়ার উপদেশ। নারীশিক্ষার সুছাঁদ বন্দোবস্ত ঠাকুর পরিবারে থাকলেও তার উদ্দেশ্য ছিল খানিকটা সীমিত। গৃহকর্মনিপুণা হওয়াটাই বড়ো কথা। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বা স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী' পত্রিকায় লিখেছেন সে সবকথা। উনিশ শতকের শেষে ঠাকুরবাড়িতে বিয়ের প্রীতি

ভট্টাচার্য, শম্পা : অভিনয়ে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা
*International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 86-92*



উপহারের কবিতাগুলির মধ্যে আদর্শ স্ত্রী হওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনীর একটি সংস্করণে এই নারীর শিক্ষিত হবার আত্মপ্রয়াসকে প্রশংসা করেছেন। রাসসুন্দীর চৈতন্যচরিতামৃত পড়তে চান একথা যদি না লিখতেন তাহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষিত হবার প্রয়াসকে কি এতটা মূল্য দিতেন?

খোলা হাওয়া ঠাকুর বাড়িতে একদিনে প্রবেশ করেনি, সময় লেগেছিল অনেকখানি। অন্দরমহলে নিঃসম্পর্কিত পুরুষের প্রবেশ ছিল বারণ। গঙ্গাস্নানে মেয়েদের পালকিসুদ্ধ চুবিয়ে আনা হত একেবারে। রাস্তায় পালকিতে যেতে হলে বাইরে উঁকি মারলে কপাটে জুটত দাসীদের কড়া বকুনি। এর মধ্যে আত্মপ্রকাশের পথটুকু খুঁজে বের করে নিতে হয়েছিল এ বাড়ির মেয়েদের। অবশ্য এ ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও কয়েকজন সাহায্য করেছেন যথেষ্ট। একে পিরালী ব্রাহ্মণ, তায় ব্রাহ্ম ফলে হিন্দুধর্মের তেমন কড়া বাধা নিষেধ ছিল না এ পরিবারে। সমাজের বাঁধন খানিকটা শিথিল বলে হয়তো ঠাকুরবাড়িতে গড়ে ওঠা একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতিতে মেয়েরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল ক্রমে ক্রমে। পাশাপাশি হিন্দু সমাজের অবস্থা খানিকটা বোঝা যায় 'নীলদর্পণ' নাটকের সরলতার উক্তিতে—'রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই।'

নৃত্যগীতের পৃষ্ঠপোষকতা ঠাকুরবাড়িতে বরাবর ছিল। উত্তর ভারতের সুবিখ্যাত বাঈজীরা যে মাঝে মাঝে মজলিশ করে গেছেন এ বাড়িতে—তাঁর উল্লেখ আছে অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বই দুটিতে। ঠাকুর বাড়ির অঙ্গনে নিয়মিত যাত্রাভিনয় হত। বউ ঝিরা জালের পর্দার অন্তরালে বসে অন্দর থেকে গান শুনতেন। কখনও বা ঘুলঘুলি দিয়ে পালা করে অভিনয় দেখতেন। বৈঠকখানা ঘরে অভিনয় হলে মা দিদিমাদের খড়খড়ি তুলে দেখার অনুমতি ছিল। ১৮৮১ খ্রিঃ বেঙ্গল থিয়েটার পুরো এক রাত্রি ভাড়া নিয়ে 'অশ্রুমতী' নাটক অভিনয় হলে বাড়ির মেয়েরা দেখতে যান। থিয়েটার হলে চেয়ার বেঞ্চি সরিয়ে এক রাতের জন্য ফরাস পেতে, কেদারা সাজিয়ে দেশি বৈঠকখানার চেহারা নিল থিয়েটার হল। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' অভিনয় হল যখন, ছেলেরা মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নটীর ভূমিকায় অনবদ্য মেক-আপে বাড়ির বাগানে ঘুরছেন দেখে প্রকৃত পরিচয় জানতে না পেরে পাশের চাটুজ্জে বাড়ি মেয়েদের এমন বেহায়াপনা দেখে রেগে অস্থির হয়ে উঠলেন। সেকালের পাবলিক থিয়েটারে অভিনয়ে বারাঙ্গনাদের ডাক পড়ত অথবা কিশোর বালকেরা মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করত। কলকাতার ধনী সমাজের মানুষজন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সঙ্গীত সমাজ। সেখানে মহিলা সভ্য ছিল না। স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মাস মাইনের বদলে কিশোর বালক সংগ্রহ করা হয়েছিল। অবশ্য সঙ্গীত সমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা নাটক অভিনয় হত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সঙ্গীত সমাজের প্রধান সম্পাদক। তার আগে ১৮৫৯ খ্রিঃ 'বেঙ্গল হরকরা পত্রিকা' মেট্রোপলিটন থিয়েটারে 'বিধবা বিবাহ' নাটকে অভিনয় দেখে প্রস্তাব করেছিলেন যে নারী ভূমিকায় যেন নারীদের গ্রহণ করা হয়। নাট্যকার মনোমোহন বসু হিন্দুদের কুলকন্যারা যে

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে পারেন এ কথা ভাবতেই পারতেন না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'মানময়ী' গীতিনাট্য (প্রথম প্রকাশ ১৮৮০) জোড়াসাঁকো পরিবারে অভিনয় হয়। বাড়ির মেয়েরা বিশেষতঃ কাদম্বরী দেবী ও নীপময়ীদেবী অভিনয় করেন। যে মেয়েরা দর্শক হিসাবে ছিলেন চিকের আড়ালে, তারা বেরিয়ে এলেন অন্তরাল থেকে বাইরে। এ নাটকে 'সজনী লো বল কেন এ পোড়া প্রাণ গেল না?' ...গানটি তে জনপ্রিয় হয়েছিল যে সমবয়সী ছেলে মেয়ের দল নিঃসঙ্কোচে বাড়িময় হৈ হৈ করে গেয়ে বেড়াত। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসব' অভিনীত হয়েছিল জোড়াসাঁকোতে একাধিকবার। 'চন্দ্র শূন্য, তারা শূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে' নিখাদ বাগেশ্রী রাগিণীতে এই সংগীতটি কাদম্বরী দেবী গাইতেন। সখী সমিতিতে পুরুষের প্রবেশ ছিল নিষেধ। একবার তারা এই নাটকটি কোনও বাগানবাড়িতে অভিনয় করার সময়ে পশ্চাৎপটে আগুন ধরে যায়। তার বর্ণনা আছে ইন্দিরা দেবীর 'নাট্যস্মৃতি'তে। অভিনয়কে বাড়ির উঠোনে টেনে আনা ও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের মঞ্চে আনা সম্ভব হল রবীন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্রের আমলে। 'বসন্ত উৎসবে' নায়িকা লীলা-কাদম্বরী, নায়ক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বিবাহ উৎসব' গীতি নাট্যে নায়কের ভূমিকায় অভিয় করতেন দিনেন্দ্রনাথের মা সুশীলা বৌঠান। 'এমন কর্ম আর করব না' নাটকে বাড়ির মেয়েরা ঘরোয়া পরিবেশে বাড়ির উঠোনে অভিনয় করেন। কারও কারও মতে এটি ছিল কাদম্বরীর প্রথম অভিনয়। কবি 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সময়ে 'শ্রীমতী হে'কে উৎসর্গ করেন। অনেকে মনে করেন এই 'হে' অর্থাৎ অলীকবাবু নাটকের (হেমাঙ্গিনী)। এই ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কাদম্বরী। পিস্‌নির ভূমিকায় বর্ণকুমারী। ইন্দিরা দেবীর স্মৃতিতে অবশ্য শরৎকুমারী নায়িকার ভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনায় এরপর 'অলীকবাবু' অভিনয় হয়েছে বটে, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর গঠনটি একটু বদলে হেমাঙ্গিনীকে রাখা হয়েছে আড়ালে। বস্তুত ১৮৭৫ খ্রিঃ থেকে ১৯২৫ খ্রিঃ সারা বাংলা দেশে নারী জাগরণের পর্ব চলেছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের অভিনয় তার অঙ্গ। প্রাথমিক ভাবে সমাজে এ নিয়ে তীব্র আলোড়ন হয়েছিল ঠিকই, পরবর্তীকালে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। আসলে ঔপনিবেশিকতার ধর্ম থেকে ঠাকুরবাড়ি বা বাংলাদেশ বিচ্যুত হয় নি। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঐতিহ্য বা পশ্চিমিয়ানা নয়—দুটির ভারসাম্যে নব্য নারীর প্রেরণা জেগে উঠল। বিদ্বজ্জন সমাগমে অভিনয়ের জন্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচিত হয়। প্রথম অভিনয় ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১।

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন জারী হবার পর বাংলার রঙ্গমঞ্চে অপেরাধর্মী গীতিনাট্য অভিনয়ের একটি আবহাওয়া গড়ে ওঠে। এই সূত্রে ঠাকুরবাড়িতে 'বসন্ত উৎসব' ও 'মানময়ী'র মতো গীতাভিনয় শুরু হয়। 'বাল্মীকি প্রতিভা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, 'আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল বাল্মীকি প্রতিভা নামের মধ্য সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে। (জীবনস্মৃতি) মহর্ষি ভবনের বারবাড়িতে, তেতলার ছাদের ওপর পাল খাটিয়ে স্টেজ বেঁধে বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয় হয়। দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বালিকারূপিণী প্রতিভাদেবীর রূপসজ্জার খানিকটা আভাস পাওয়া যায় রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বালিকা প্রতিভা' কবিতায়।



'পরণে গেরুয়া বাস, আলু থালু কেশ-পাশ
কি এক অপূর্ব প্রভা উথলে ও বরাননে।
অলঙ্কার বলে কারে, ও বালিকা জানে যারে,
প্রকৃতির অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা অযতনে।
(আর্য্যদর্শন বৈশাখ ১২৮৮)

প্রতিভার অভিনয়ের যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন 'সাধারণী' সাপ্তাহিক পত্রিকা। 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রাথ ঠাকুর স্বয়ং বাল্মীকি হন আর 'প্রতিভা' নাম্নী প্রতিভা সম্পন্ন তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয়া ভ্রাতুষ্কন্যা বাগ্‌দেবী রূপে অভিনয় করেন। বঙ্গ-কুল-কুমারী কর্তৃক রঙ-বেদী এই প্রথম উজ্জ্বলীকৃত হইল। বঙ্গ রঙ্গ-ভূমির নব কলেবরের এই অভিষেক ক্রিয়ায় প্রতিভা উপযুক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী বটেন। তিনি সুকণ্ঠী, গীতিনিপুণা, সতেজ—নয়না এবং বীরপদ বিক্ষেপ-কারিণী। তাঁহার গীতাভিনয়ে দর্শকবৃন্দের অনেকে বিস্মিত এবং প্রীত হইয়াছিলেন।' (২৭ ফেব্রু, ১৮৮১) জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ৫ই মার্চ বিদ্বজ্জন সমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশনে নাটকটি আবার অভিনয় হয়। প্রথম মঞ্চাবতরণে প্রতিভাকে সহ্য করতে হয় নি অপমানের গ্লানি। লক্ষ্মীর ভূমিকাভিনয়ে ছিলেন শরৎকুমারীর বড় বোন সুশীলা। তার বোন সুপ্রভা 'বিবাহ উৎসব' নাটকে ছিলেন নায়কের বন্ধু। আসলে ঠাকুরবাড়িতে প্রত্যেকে বিয়েতে একটি থিয়েটার হত। পিরালী ব্রাহ্মণ তায় ব্রাহ্ম বলে আত্মীয়স্বজনেরা সকলে এক পংক্তিতে ভোজন করতেন না সামাজিক উৎসবে। সামাজিক মেলামেশা তেমন ছিল না বলে একমাত্র অভিনয় অনুষ্ঠানগুলিতে ছিল সকলের অবারিত দ্বার, সামাজিকতার অবাধ সুযোগ।

১৮৯৩ খ্রিঃ লেডি ল্যান্সডাউনের সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে জোড়াসাঁকো বাড়িতে 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয় হয়। সেখানে হাতবাঁধা বালিকা সাজলেন অভিজ্ঞা আর লক্ষ্মী ইন্দিরা দেবী। সাদা শোলার পদ্মফুলে শুভ্র সাজে প্রতিভা যখন অস্ট্রিচ পাখির ডিমের খোলা দিয়ে তৈরি বীণা হাতে নিয়ে বসেছিলেন-মাটির প্রতিমা বলে ভুল করেছিলেন দর্শক। তারপর উঠে এসে কবিকে বীণা হাতে তুলে দিয়ে বলতেন—'এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার। যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।'

বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষ্যে অভিনয়ের জন্য রচিত হয় 'কালমৃগয়া'। দশরথের দ্বারা অন্ধমুনির পুত্রবধ নাট্য বিষয়। ঠাকুরবাড়িতে ১৮৮২ খ্রিঃ ২৩শে ডিসেম্বর তেতলার ছাদে স্টেজ বেঁধে এর অভিনয় নয়। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা অভিজ্ঞা দেবী ও পরিবারের মেয়েরা এতে অভিনয় করে। ইন্দিরা দেবীর কথা—'আমি ও ঊষাদিদি (দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা) কালমৃগয়া বনদেবী সেজে সমুখেতে বহিছে তটিনী, গানটিতে এক জায়গায় বসে ডান হাতের ভঙ্গিতে সামনের দিকে কেমন তটিনী বয়ে যাচ্ছে আর দু-আঙুল উপরে তুলে 'দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া' দেখাতাম, সে গল্প করে সেদিন পর্যন্ত কত মেয়েদের হাসিয়েছি।' (রবীন্দ্র স্মৃতি) মন্মথনাথ ঘোষ 'সাপ্তাহিক ভারতবন্ধু' পত্রিকায় লেখেন 'এই নাটকে' গৃহদেবীরা বনদেবী সাজিয়া অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন,...মুনিকুমার পিতার নিকট জল আনিতে গেলে লীলা তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে অন্ধমুনির নিকটে যেরূপ গান গাহিয়াছিল, তাহা শুনিলে

পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। অভিজ্ঞার অভিনয়ে দর্শক আপ্লুত হন। মনে রাখতে হবে যে এই সময়ে ঠাকুরবাড়িতে জনসমক্ষে অভিনয়ে বাড়ির ছোটোমেয়েরা অংশগ্রহণ করছেন, তরুণীরা নন। পরবর্তীকালে এই ধরনের অভিনয়ে মহিলারা অংশগ্রহণ করলেও বাইরের কোনও ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতেন না।

থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির মহিলা শাখার সদস্য নিয়ে গড়ে ওঠে সখী সমিতি। সখী সমিতি নামটি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। এদের উদ্যোগে ১২৯৫ খ্রিঃ মহিলা শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হলে 'মায়ার খেলা' অভিনয় হয়। রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ। বাংলার তৎকালীন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের স্ত্রী এই হস্তশিল্প মেলার উদ্বোধন করেন। মেলায় ক্রেতা ও বিক্রেতা মহিলা। এমনকি বিক্রয়ের শিল্পদ্রব্যগুলি ছিল মহিলাদের দ্বারা তৈরি। মহিলাদের নানা বিষয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা ছিল এদের লক্ষ্য। অবশ্যই স্বদেশি মেলার প্রভাব ছিল এখানে। শান্তার করুণ মধুর বিষণ্ণ মূর্তি দর্শককে আকৃষ্ট করেছিল। এ অভিনয়ে পুরুষদের কোনো সংস্রব ছিল না। কবি গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী লিখেছিলেন যে, এই অভিনয়ে মেয়েরা পুরুষদের মতো সামনের গ্যালারিতে বসে সে অভিনয় দেখে এবং সকলে এক নতুন আমোদ উপভোগ করে। (দ্রষ্টব্য মিলন কথা, 'ভারতী' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩) পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে ঠাকুরবাড়িতে। তাই আর বালিকা নয়, তন্বীরা অভিনয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। পুরুষেরা অবশ্য অন্তরাল থেকে সাহায্য করছেন পুরোদমে।

বাংলাদেশে মহিলারা যখন ক্রমে পৃথিবীটাকে একটু একটু করে চিনে নিতে চাইছেন তখন মহারাষ্ট্রে পড়িয়া রমাবাই স্ত্রী স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলছেন। রবীন্দ্রনাথ পুণাতে থাকার সময়ে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে রমাবাইয়ের বক্তৃতা শুনেছেন। পণ্ডিত রমাবাই তখন বালবিধবাদের দুর্দশা নিয়ে মহারাষ্ট্রে নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী নেতারা রমাবাইয়ের চরম শত্রু। এমনকি তাঁর বক্তৃতাগুলি তাঁরা হৈ চৈ করে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। রবীন্দ্রনাথ এ সব খবর জানিয়ে একটি পত্র প্রবন্ধে লিখেছেন যে সন্তানধারণ থেকে স্ত্রী পুরুষে প্রধান প্রভেদ, তার জন্য মেয়েদের বলের অভাব, বলিষ্ঠ বুদ্ধির অভাব এবং হৃদয়ের আবেগের বাড়াবাড়ি। ('ভারতী ও বালক', আষাঢ় ১২৯৬) পরের মাসে ওই পত্রিকায় 'রমাবাই' প্রবন্ধে সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী লেখেন 'স্ত্রীলোকের একরকম গ্রহণশক্তি ও ধারণ শক্তি আছে, কিন্তু সৃজন শক্তি নাই, একথা লেখক কিরূপে স্থির করিলেন তাহা বুঝিতে পারি না'। নারী পুরুষের প্রতিভার পার্থক্য যে আছে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ এ ধারণা হয়তো পোষণ করতেন। মনে পড়বে এ কথা—'আমি যদি আমার ন' দিদি হতুম তবে কি অমনি আমার জায়গায় আমি উঠতে পারতুম। সংসারের বাধাবিঘ্ন ছেড়ে দে, তা না হলেও মেয়েদের ব্রেন এতটাই কাজ করতে পারে না।' ('আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', রানী চন্দ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) মহারাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদী দল ও গোঁড়া হিন্দু এই দুইয়ের আক্রমণে অতিষ্ঠ পণ্ডিত রমাবাই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। হিন্দুরা নারীজাতিকে যেভাবে বিম্বিত করতে চাইল তাতে আঘাত হানলেন তিনি। শক্তিধর ঔপনিবেশিকরা যেভাবে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার চাইলেন, হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাদের স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা তার থেকে সামান্য আলাদা



ছিল। নারী জাগরণের পালায় মেয়েদের মেমসাহেব করে তোলা যাবে না কোনোমতে। এটা তাঁর অপসংস্কৃতি বলে মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আনিয়া লুম্বার উক্তি— The ideal woman here is constructed in opposition to the spectre of the memsahib, if fuses together older brahminical notions of female self-sacrifice and devotion in the victorial ideal of the enlightened mother, devoted exclusively to the domestic sphere. (colonialism / post colonialism (Rout Ledge, 1998) এইসব কথার অবতারণা করতে হল এই কারণে যে, ঠাকুরবাড়িতে মেয়েদের অভিনয়ের এক ধরণের সীমাবদ্ধতা ছিল একথা ভুললে চলবে না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' স্ত্রী স্বাধীনতাকে পরিহাস করে লেখা। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও কয়েকজনের প্রভাবে তার মনের মধ্যে পরিবর্তন হয়। 'দুঃখিত ও অনুতপ্ত' হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর প্রচার বন্ধ করেন। 'রাজা ও রানী' প্রকাশিত হলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করলেন রবীন্দ্রনাথ। বইটি পাঠ করে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন 'রাজাটা is of a peculiar character one sided out of joint unreasonable-inconsiderate স্ত্রীলোকের এইরূপ স্বভাব naturally suit করে কিন্তু পুরুষেরা তাও শুধু নয়।' মনে ও মননে স্ত্রীলোকেরা যে অধস্তন জাতি এই মন্তব্যে এমন ভাব ও ভাবনা উঁকিঝুঁকি মারে। ১৮৮৯ খ্রিঃ নাগাদ বির্জিতলাও-র বাড়িতে 'রাজা ও রানী' অভিনয় হয়। সুমিত্রার ভূমিকায় জ্ঞানদানন্দিনী, সত্যেন্দ্রনাথ—দেবদত্ত। ইলা-প্রিয়ম্বদা দেবী কিংবা প্রতিভা দেবী। পরদিন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় 'ঠাকুরবাড়ির নতুন ঠাট' নামে একটি শ্লেষাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক কালে পেশাদারী থিয়েটার 'রাজা ও রানী'র অভিনয়কালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে বহু নকল করে।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা এবং সাধারণ রঙ্গালয় 'বিসর্জন' অভিনয় করেছেন বহুবার। রবীন্দ্রনাথ নিজের পরিবার এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের নিয়ে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছেন। অভিনয় হয়েছিল একবার ৪৯নং পার্ক স্ট্রিটে ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সামনে। পরবর্তীকালে ১৯২৩ খ্রিঃ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে পরপর চারদিন 'বিসর্জন' অভিনীত হয়। অপর্ণার ভূমিকায় ছিলেন রাণু অধিকারী, পরের অভিনয় করেছেন সুরেন ঠাকুরের মেয়ে গুণবতী, সংজ্ঞা দেবী। এই নাটকে অপর্ণাকে অভিনয় শিক্ষা দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'ফাল্গুনী'র অভিনয় সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় আছে যে শান্তিনিকেতনের শিক্ষিকা এক মেমসাহেবকে মাথায় রুমাল বেঁধে সামান্য মেক-আপ দিয়ে নামানো হয়েছিল মঞ্চে। পরিবারের বাইরে এদেশি এমনকি বিদেশি মহিলারাও রবীন্দ্রনাথের নাটকের মঞ্চাভিনয়ে প্রবেশ করলেন কালক্রমে। এভাবে মেয়েদের অভিনয়ের পথ মসৃণ হয়ে উঠল। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাঙালী পুরুষ যেমন স্বাধীনতা দাবি করল, বঙ্গললনারাও বিলিতি শিক্ষা লাভ করে শুধুমাত্র জায়া ও জননী হিসেবে নিজের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে চাইলেন না।

বিশ শতকে শিক্ষিতা মহিলাদের অভিনয় জগতে আসার পশ্চাৎপট হিসেবে

জোড়াসাঁকোর বাড়ির মেয়েদের অবদান বিস্মৃত হওয়া যায় না। 'তপতী' নাটকে অমিতা ঠাকুরের অসাধারণ অভিনয় প্রাণের ভিতরে গিয়ে নাড়া দিয়েছিল দর্শকের। তপতীর সমস্ত ছবি এঁকে রেখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। অমন অভিনয় আর কখনো দেখতে পাননি বলে একবার রবিকাকাকে খেদ করে বলেছিলেন তিনি—'করলে কি রবিকাকা, ঘরের পিদিম নিভিয়ে ফেললে, এখন বাইরের পিদিম জ্বালিয়ে কী করবে।' রবিকাকা বললেন, 'তা আর কী করা যায়, চিরকালই কি আর ঘরের পিদিম জ্বলে।' ঘরের পিদিমের আগুনটুকু ছিল তাই বাইরের প্রাঙ্গণ হয়ে উঠল উজ্জ্বল, আলোময়। সহজ সত্যি কথাটা এটাই।

*Shampa Bhattacharya, Department of Bengali, B.K.C. College, Kolkata*
***shampa tinku@yahoo.co.in***

# বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদ : বিবর্তনের গতিমুখ

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

'প্রতিবাদ' নামক শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথেই এক দ্বান্দ্বিক আবহ আমাদের চেতনাকে আলোড়িত করে, অন্যতর বোধে উজ্জীবিত করে। জীবন ও জীবিকার নিত্য সংগ্রামে, শোষণ ও বঞ্চনার নিত্য পেষণে জর্জরিত মানুষের দমবন্ধ করা হাহাকার বাঙ্ময় হয়ে ওঠে 'প্রতিবাদ'-এ। এ কারণেই 'প্রতিবাদ' পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনিবার্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। আমরা এমন এক সময়ের মধ্যে দিয়ে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে চলেছি; যে সময়ে, "...জোতির্বিদেরা আমাদের বুঝিয়েছেন নক্ষত্রে কক্ষপথে আমাদের এই জীবন চকিত একটা মুহূর্ত মাত্র; ভূতাত্ত্বিকেরা জানিয়েছেন দুই হিমযুগের মধ্যবর্তী অনিশ্চিত এক ছেদ মাত্র আমাদের এই সভ্যতা; জীববিজ্ঞানীরা বলেছেন আমাদের গোটা অস্তিত্বটাই শুধু যুদ্ধ, দেশ জাতি সংঘ বা ব্যক্তির পারস্পরিক গ্রাস শুধু; ঐতিহাসিকেরা বলেছেন প্রগতির ধারণা শুধু একটা মায়া, অনিবার্য ধ্বংসের দিকেই গড়িয়ে যায় সমস্ত গরিমা; মনোবিদরা জানান আমাদের ইচ্ছাশক্তি কেবল পরিবেশ আর পরম্পরা চালিত; অক্ষয় আত্মা বলে যাকে ভাবি সে কেবল মস্তিষ্কের ক্ষণিক স্ফুরণ। শিল্পবিপ্লব ধ্বংস করেছে আমার ঘর, জন্মনিরোধের আবিষ্কার ধ্বংস করেছে আমাদের পরিবার। প্রেম, সে কেবল শারীরিক সমীপতা; বিবাহ একটা সাময়িক কায়িক সুবিধে। গণতন্ত্রের পচন ঘটে গেছে; সমাজতন্ত্রের স্বপ্নও লুপ্ত হবার পথে। যেকোনো আবিষ্কার শক্তিমানকে আরো একটু শক্তি দেয়, দুর্বলকে করে দুর্বলতর; যেকোনো নতুন যন্ত্র বাতিল করে দিচ্ছে মানুষকে আর বহুগণিত করে তুলছে যুদ্ধভয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, কোনো দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণে আর পাওয়া যাবে না তাকে। জীবন মানে মানবপতঙ্গের বিস্তার শুধু, যেন গ্রহমণ্ডলের ক্ষত। কিছুই নিশ্চিত নয় এখানে, একমাত্র পরাভব আর মৃত্যু ছাড়া।" ("জীবন-মৃত্যুর শব্দ শুনি" : শঙ্খ ঘোষ, "বিষয় : জীবনানন্দ" : সম্পাদনা দেবেশ রায়, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৬৭)।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, মীমাংসাহীন এই সর্বনাশের মাঝে দাঁড়িয়ে 'সাহিত্য' আমাদের অনিবার্য আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে কেন? আমাদের প্রিয় কবি জীবনানন্দ তাঁর নিজের ডায়েরিতে লিখেছিলেন যে "exile, anguish, ignomity and misery'-র মধ্যে থেকে যাওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো উপায় নেই। তাই তাঁর উচ্চারণ, "হয়তো বা ক্রান্ত ইতিহাস/শাণিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস"। এর পরই আমাদের মনে হয়, জীবনের এহেন 'anguish' আছে বলেই কী

চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম : বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদ : বিবর্তনের গতিমুখ
*International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 93-99*